Journal of Sociology
Vol. 14 Issue 1& 2, 2023
ISSN: 1813-2871

Nazmul Karim Study Center
University of Dhaka

প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্যের নিদর্শন 'সাংকাশ্য': অতীত ও বর্তমান

(The '*Sāṃkāshya*' As A Sign of Ancient Buddhist Traditions: Past and Present)

ড. শামীমা নাছরিন*

সারসংক্ষেপ

বৌদ্ধ ঐতিহ্য বা ঐতিহাসিক স্থান বলতে সেই স্থানকে বোঝানো হয় যেখানে বুদ্ধজীবনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, প্রসিদ্ধ থের-থেরী কিংবা ভিক্ষু-ভিক্ষুনী এবং অতীতের বৌদ্ধ রাজা-মহারাজা, শ্রেষ্ঠী তথা স্বনামধন্য মহাপুরুষের রেখে যাওয়া কৃর্তি উপস্থাপিত হয়েছে এমন স্থানকে নির্দেশ করে। এমন সব কীর্তি কালের আবর্তে কখনো কোনোটি টিকে গিয়েছে আবার কখনো কোনোটি হারিয়ে গিয়েছে। যেটি হারিয়ে গিয়েছে সেটি পরবর্তীতে প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকরা তা আবার আবিষ্কার করেছেন। বৌদ্ধ ঐতিহ্যের এমন অনেক ঐতিহাসিক স্থান রয়েছে এবং সেই ঐতিহাসিক স্থানসমূহও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে 'অষ্টমহাতীর্থস্থান' নামে যে বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্থানসমূহ রয়েছে তা প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্যের সাক্ষী হিসেবে টিকে আছে। তেমনি 'সাংকাশ্য' হলো 'অষ্টমহাতীর্থস্থান' ও প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি। ত্রিপিটক তথা বৌদ্ধ ইতিহাসে এবং রামায়ন-মহাভারত ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে এই 'সাংকাশ্যের' নাম উল্লেখ পাওয়া যায়। যার ইতিহাস ও ঐতিহ্য আজও গৌরবের সাথে বহন করছে। 'সংকস্স' হলো উত্তরপ্রদেশের ফারুক্কাবাদ জেলার একটি গ্রাম। বর্তমানে এর নাম 'সংকিশ-বসন্তপুর'। এই 'সাংকাশ্য' ভগবান বুদ্ধের ও ধর্মের স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহের মধ্যে অন্যতম গৌরবোজ্জ্বল স্থান। সংস্কৃতি, ভাষা, ধর্ম ও ভূসংস্থানের বৈচিত্র্যের সঙ্গে সমৃদ্ধময় ভূমি ভারতবর্ষ, আর পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ গন্তব্যস্থল হিসেবে এক বিশিষ্ট স্থান অর্জন করে রয়েছে ভারতবর্ষের এই 'সাংকাশ্য নগরী'।

সূচকশব্দ: প্রত্নতত্ত্ববিদ, সাংকাশ্য, অষ্টমহাতীর্থস্থান, মহাজনপদ, কপিথ ও মৃৎশিল্প।

Abstract

Buddhist heritage or historical place refers to the place where the works left by the famous 'Thera-Therī' or monks and nuns and the Buddhist kings-mahārājās of the past, great or renowned Mahāpurusha, are presented. Some of these feats have survived, and some have been lost. What was lost was later rediscovered by historians. The Buddhist tradition encompasses numerous historical sites, all of which hold significant importance. In the history of Buddhism, the famous historical places known as 'Ashtamahātīrthasthāna' have survived as witnesses of the ancient

* সহকারী অধ্যাপক, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ই-মেইল: shamima.nasrin@du.ac.bd

DOI:

Buddhist tradition. Likewise, 'Sāṃkāshya' is one of the 'Ashtamahātīrthasthāna' and one of the ancient Buddhist traditions. The name of this 'Sāṃkāshya' is mentioned in Tipiṭaka, or Buddhist history, as well as in the Ramayana-Mahabharata and other ancient texts. People still carry its history and tradition with pride. 'Saṃkassa' is a village in the Farukkabad district of Uttar Pradesh. Currently, its name is 'Saṃkisha-Basantpur'. This 'Sāṃkāshya' is one of the most glorious places among the memorials of Lord Buddha and Dhamma. India is a rich land with diversity of culture, language, religion, and topography, and this 'Sāṃkāshya Nagar' of India has earned a prominent place as the best destination in the world.

ভূমিকা

পৃথিবীর প্রতিটি জাতি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা দেশের পরিচিতির জন্য এমন কিছু অঞ্চল, স্মৃতিচিহ্ন বা প্রতীক থাকে যা পুরো দেশ বা জাতির কাছে সৌন্দর্যশৈলীর আকর্ষণীয় নিদর্শন। বিশ্বের কাছে ভারতভূমি প্রাচীন সভ্যতার বিচিত্র শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক ধ্যান সাধনার দেশ। সভ্যতার আলোর ঝলকে প্রাচীন পৃথিবীর যেসব এলাকা প্রথমবারের মতো উদ্ভাসিত হয়েছিল ভারত সেসব এলাকার একটি। ভারতীয় উপমহাদেশের ভূ-প্রকৃতি ছিলো বৈচিত্র্যময়। মহামানব গৌতম বুদ্ধ সুদীর্ঘ ৪৫ বছর ধর্ম প্রচারের সময়ে ভারতের নানা জায়গায় বর্ষাবাস যাপন করেছিলেন এবং ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন। সে সমস্ত পবিত্র বুদ্ধভূমি তীর্থস্থান হিসেবে পরিগণিত। বুদ্ধানুরাগী ভক্তরা তাদের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ভারতবর্ষে ভ্রমণ করে থাকেন। বৌদ্ধতীর্থস্থান হিসেবে 'সাংকাশ্য নগর' অন্যতম একটি স্থান হিসেবে বিবেচিত। তাই এটি তীর্থস্থান দর্শনের পুণ্যার্জনের একটা বিশেষ স্থান হিসেবে বিবেচিত। যেহেতু এই তীর্থস্থানটি প্রায় আড়াই হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য ধারণ ও বহন করছে এবং সেকারণে সময়ের পরিক্রমায় একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। আবার 'সাংকাশ্য' তথা 'সাংকাশ্য নগর' বর্তমান যে অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে, সারা পৃথিবীর বৌদ্ধধর্মালম্বীদের নিকট এটি কেমন গুরুত্ব বহন করছে এবং সারা বিশ্বের পর্যটকদের এটি কিভাবে আকৃষ্ট করছে ইত্যাদি উপস্থাপন করা এ গবেষণার অন্যতম একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ফলে 'সাংকাশ্য' সম্পর্কে নতুনভাবে জানার আগ্রহ সৃষ্টি করবে বলে ধারণা করা যায়।

১. বুদ্ধের বিচরণ ক্ষেত্র

'সাংকাশ্যের' মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে বুদ্ধ কোথায় কোথায় বিচরণ করেছিলেন তার একটি চিত্র জানা প্রয়োজন। জগতে বুদ্ধ নামে খ্যাত হওয়ার পর দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধর্মপ্রচার করেছিলেন। তাঁর ধর্মপ্রচারের ধারাবাহিক তথ্য পাওয়া যায়। ত্রিপিটক সাহিত্যে বিশেষ করে বিনয় পিটকের অন্তর্গত *'মহাবগ্গ'*, *'চূলবগ্গ'* এবং *'সূত্তবিভঙ্গ'* গ্রন্থে। এছাড়া *'মহাপরিনির্বাণ সূত্র'*, *'সংযুক্তনিকায়'* এবং *সুত্তনিপাত* প্রভৃতি গ্রন্থেও বিক্ষিপ্তভাবে নানা তথ্য পাওয়া যায়। নিম্নে বুদ্ধের ধর্মপ্রচার, অবস্থান ও বিচরণের রাজ্যসহ স্থানসমূহ উল্লেখ করা হলো; যেমন-

অঙ্গ : চম্পা, ভদ্দিয়, কোটিগ্রাম, আপণ, অঙ্গুত্তরাপ।
মগধ : রাজগৃহ, দক্ষিণাগিরি, চোদনাবত্থু, পাটলিগ্রাম, নালন্দা, উরুবেলা গয়াশীর্ষ।
বজ্জি : বৈশালী, নাদিক, বেলুব, ভণ্ডগ্রাম, হত্তীগ্রাম, জম্বুগ্রাম, ভোগনগর।
মল্ল : পাবা, অনুপ্রিয়, কুশীনারা।
কোসল : শ্রাবস্তী, কপিলবস্তু, আতুমা, বেরঞ্জ।

কাসি : বারাণসী, কিটাগিরি, আলবী।
বংস : কোসাম্বী, বালকলোকনকারগ্রাম, পারিলেয়্য, ভগ্ন বা সংসুমাগিরি, প্রয়াগ।
চেতি : প্রাচীন বংসদায়, ভদ্দবতিকা।
পাঞ্চাল : সোরেয়্য, সাংকাশ্য, কণ্নকুজ্জ।

অন্যান্য স্থানের মধ্যে অস্সপুর, কিম্বিলা, চালিকা, বিদেহ, মিথিলা, শাক্যনগর, কোলিয়, সাকেত, শাল, দেশক, নালকপণ ও কুরু।

২. সাংকাশ্যের ভৌগোলিক অবস্থান

প্রথমেই 'সাংকাশ্যের' ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে ধারণা তুলে ধরা প্রয়োজন। প্রাচীন ভারতের ষোড়শ মহাজনপদের অন্যান্য প্রসিদ্ধ জনপদের মতো পাঞ্চাল রাজ্যও অন্যতম রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত। উত্তর প্রদেশের রোহিলখণ্ড ও ফারুক্কাবাদ জেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকা নিয়ে এ রাজ্যের অবস্থান। ভারতের উত্তর প্রদেশের ফারুক্কাবাদ জেলায় বর্তমানে 'সংকিস' নামে পরিচিত প্রাচীন 'সঙকস্স' পাঞ্চাল রাজ্যের সুপ্রসিদ্ধ নগরী। ইক্ষু নদীর তীরে অবস্থান ছিলো 'সাংকাশ্য নগরীর'। সামগ্রিকভাবে উত্তর প্রদেশে বুদ্ধ মতবাদের জনপ্রিয়তা অধিক ছিল। বুদ্ধের সময়কালে 'সঙকস্স' ছিলো বৌদ্ধ ধর্মের এক শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান। মনে করা হয় তৎকালে অত্যন্ত প্রাণবন্ত অবস্থায় ছিলো। বাংলায় বলা হয় 'সাংকাশ্য' যা পালি 'সংকস্স' এবং সংস্কৃতে 'সংকাস্য' নগর নামে পরিচিত ছিল। চীন দেশে 'সাংকাশ্য' নগর 'কপিথ' নামে চিহ্নিত। এ রাজ্যের ইতিহাস ঐতিহ্য ও বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত নিদর্শন 'সাংকাশ্য' নগরে বিক্ষিপ্তভাবে অনেক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রন্থ '*মহাভারতে*'ও পাঞ্চাল রাজ্যের প্রসিদ্ধির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কুরু এর প্রতিবেশী রাজ্য হিসেবে পাঞ্চালের নাম ছিলো সুপরিচিত। সংস্কৃত মহাকাব্য '*রামায়ণে*' এই স্থানটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও সীতার পিতৃব্যের (জেঠা বা খুড়া) রাজ্যের রাজধানী 'সাংকাশ্য' বলে মনে করা হয়। প্রথমদিকে এই রাজ্যে রাজতান্ত্রিক কাঠামোতে পরিচালিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ অব্দ থেকে প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলত খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে ভারতীয় ইতিহাস নতুন আলোয় আলোকিত হয়েছিল। পাঞ্চাল রাজ্যের মুদ্রা সাধারণত পুরু, গোলাকার বা ডিম্বাকার।[৩]

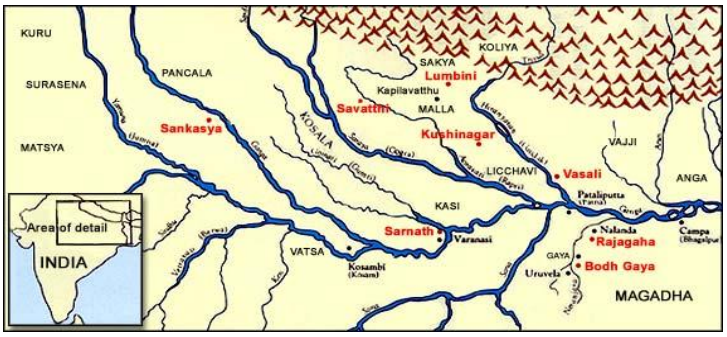

প্রাচীন ভারতের ষোড়শ মহাজনপদ ও তার অন্তর্গত পাঞ্চালে 'সাংকাশ্যের' অবস্থান।[৩]
মানচিত্র-১

'*চেতিয় জাতক*' পাঠে জানা যায় যে, চেদি বা চেতিরাজ উপচরের চতুর্থ পুত্র যে স্থানে মণিমুক্তা খচিত রাজকীয় চক্রপঞ্জর লক্ষ্য করেন সেই স্থলে যে নগর প্রতিষ্ঠা করা হয় তার নাম রাখা হয়

উত্তর পাঞ্চাল।[৪] 'সাংকাশ্যের' অবস্থান যথাযথভাবে প্রদর্শনের উপায় ও নিম্নে উপস্থান করা হলো।

অন্যান্য আটটি বৌদ্ধ তীর্থস্থান এবং উল্লেখযোগ্য কাছাকাছি শহরগুলির সাথে সম্পর্কিত 'সাংকাশ্যের' মানচিত্র।[৫]
মানচিত্র-২

'সাংকাশ্যে' যাতায়াত করার জন্য উত্তর রেলপথের সাইখোয়াবাদ-ফারুক্কাবাদ শাখার পাখ্ন ষ্টেশনে নামতে হবে, যে ট্রেন দিল্লী বা আগ্রা থেকে আসছে। পাখ্না থেকে ঘোড়ার টানা টাঙ্গর চড়ে 'সাংকাশ্যে' আসতে হবে। ফতেপুরগড় থেকে বাসেও আসা যায়। আর থাকার জন্য PWD-বাংলো (Ex.Engn-Fategarth.Dist Farrukhabad) যাত্রী নিবাস ও ধর্মশালা আছে।

৩. বৌদ্ধ সাহিত্যে নগর

'সাংকাশ্য' এর আর একটি পরিচিতি হলো প্রাচীন বৌদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থান ও নগর। তাই 'সাংকাশ্য নগরের' বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে নগরের ধারণা উপস্থাপন করা প্রয়োজন। মানুষ কখন কিভাবে নগর গড়ে তুলেছে তা নিশ্চিত করে বলা বেশ কঠিন। নগরের উৎপত্তি ও বিকাশ বেশ প্রাচীন। নগর বলতে আমরা বুঝি যেখানে ভিন্ন ভিন্ন পেশার বহুসংখ্যক লোকের বসবাস এবং শিল্প-বাণিজ্যাদির স্থান। এখানে পরোক্ষভাবে বিভিন্ন পেশার বহুসংখ্যক জনসংখ্যার সমষ্টিকে ইঙ্গিত বহন করে এবং যার ফলে নগর জীবন গড়ে উঠতে পারে। আর বাণিজ্য হচ্ছে নগর গড়ার প্রধান উৎস। কারণ বাণিজ্যের প্রসারতার সাথে সাথে শিল্পের প্রসারতা গড়ে উঠে এবং শিল্পোৎপাদিত দ্রব্যের জন্য বাজারের সৃষ্টি হয়ে থাকে। তা ক্রমান্বয়ে নগরের উৎপত্তি করে। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ হাজার বছর আগে মিশর, মেসোপটেমিয়া ও ভারতে সর্বপ্রথম নগরের উৎপত্তি হয়েছে। মেসোপটেমিয়ার নগরসমূহ এই সময় ভাস্কর্য, স্থাপত্য, চিত্রকলা, শিল্পকলা ও নাট্যকলার অপূর্ব মিলনে যেমন শহরের নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে; তেমনি জ্ঞানের বিকাশ, দলিল লিখন, রেকর্ড ও মুদ্রণ আবিষ্কার, আমলাতন্ত্র, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা নগর সভ্যতার বৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটায়।[৬] এরই ধারাবাহিকতায় খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে মিশরীয় নগরসমূহের বিকাশ, খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দে প্রাচীন ভারতীয় ও চীনের নগরসমূহের এবং খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দের দিকে মেক্সিকোর মায়া ও ইনকা সভ্যতার বিকাশ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। খ্রিঃ পূঃ পঞ্চম শতকের প্রসিদ্ধ এথেন্স নগরীর মতো খ্রিঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে ভারতবর্ষের বৈশালী,[৭] কোশাম্বী,[৮] শ্রাবস্তী,[৯] রাজগৃহ[১০] প্রভৃতি নগরী ছিল উন্নত ও সমৃদ্ধশালী। এছাড়াও বুদ্ধের স্মৃতিময় স্থানগুলো আজও কালের সাক্ষী হয়ে আছে। পালি তথা বৌদ্ধ সাহিত্যে বর্ণিত বিভিন্ন শব্দ যেমন- নিগম, নগর, নগরক, রাজধানী, পুর ও পত্তন প্রভৃতি। উপরিউক্ত শব্দগুলোতে নগর বৈশিষ্ট্যের সাথে পরিচয় থাকার কারণে সেগুলোকে নগররূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। নগরের প্রধান ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো- গ্রামাঞ্চলের তুলনায় স্বল্পমাত্র স্থান আশ্রয় করে অধিকতর সংখ্যক লোকের

বসবাস, সীমাবদ্ধ বাসস্থল, প্রধানত খাদ্যোত্তর সামগ্রীর উৎপাদন এবং অন্যদিকে খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের জন্যে গ্রাম নির্ভরতা, বণিকশ্রেণির সাথে গভীর সম্পর্ক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক এমন কি, ব্যবসা বাণিজ্যগত এবং কখনো ধর্মীয় কেন্দ্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।[১৯] পালি সাহিত্যে নগরের বর্ণনায় পুনঃপুনঃ প্রাকার (পাকার), পরিখা, তোরণ (দ্বার), গড় (অট্টালক) প্রভৃতির উল্লেখের মধ্যেও নগরের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিশেষ করে বৌদ্ধযুগে নগর, গ্রাম ও জনপদ সমৃদ্ধময় ছিল। *'মিলিন্দ পঞ্হ'*[২০] গ্রন্থের মধ্যে নগর, গ্রাম ও জনপদের বহু নাম পাওয়া যায়। যেমন- অমরাবতী, কপিলবত্থু, কাসিপুর, কুসাবতী এবং দেবনগরী প্রভৃতি। এ সকল নগরীসমূহের আকার-আয়তনকে সুরক্ষণ ব্যবস্থা, কোথায় কোনো বাজার, রাজধানী, সৈন্য-শিবির, বাণিজ্যিক স্থান, পর্যটন কেন্দ্র, তীর্থস্থান, নদ-নদী ও বন্দরের অবস্থান যে ছিল পালি সাহিত্যে তার সত্যতা পাওয়া যায়।

নগরকে লক্ষ্য করে সভ্যতা গড়ে উঠেছে। নগরকে বলা হয় উন্নয়নের মাপকাঠি। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা নগরের পরিবর্তন হয় এবং সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলো নানাভাবে করায়ত্ত করা যায়। আর নগর মানুষের কল্যাণময় চিন্তারই এক অনিবার্য ফলশ্রুতি। নগর ও রাজনৈতিক ঘটনাবলি নিয়ত পরিবর্তনশীল বিধায় সদা প্রবাহমান। আর এই প্রবাহমানতার কারণেই নগরকে নিয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতদের চিন্তাধারায় বৈচিত্র্য বিদ্যমান। প্রাচীন নগরসমূহের বিকাশকে গোরডোন সাইল্ড (Gordon Childe) নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যের আলোকে নগর বিপ্লব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[২১] যেমন:

১. জনবহুল স্থানে স্থায়ী বসতি,
২. কৃষি কাজবিহীন বিশেষ কার্যাবলি,
৩. ট্যাক্স ও পুঁজির সঞ্চয়ন,
৪. বিশেষ আকর্ষণীয় সরকারি ভবন,
৫. একটি শাসক শ্রেণি,
৬. লিখন পদ্ধতি,
৭. ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান বিজ্ঞান। যথা : পাটিগণিত, জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিদ্যা,
৮. শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি,
৯. নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য বাণিজ্য ও
১০. সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে জ্ঞাতি সম্পর্কের পরিবর্তে আবাসিক সদস্যের ধারণা।

ভগবান তথাগত তাঁর জীবদ্দশায় কয়েকবার এই 'সাংকাশ্য' নগরে এসেছিলেন। শুধু তাই নয় বুদ্ধ এখানে অবতরণও করেছিলেন। এর একটি ঐতিহাসিক ঘটনাও রয়েছে। বুদ্ধ তিনমাস মাতৃদেবীকে দর্শন ও কৃতজ্ঞতাস্বরূপ মাতৃদেবীকে তাবতিংস স্বর্গে অভিধর্ম দেশনা করেছিলেন। প্রত্যাবর্তনের সময় 'সাংকাশ্য' নগরেই অবতরণ করেছিলেন। সেকারণে 'সাংকাশ্য' আজও পৃথিবীর ইতিহাসে এত মর্যাদার স্থানে অধিষ্ঠিত। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বৌদ্ধধর্মালম্বীরা ও অন্যান্য পর্যটকরা 'সাংকাশ্য' পরিভ্রমণ করে থাকেন।

৪. নগর ও সাংকাশ্য নগর গড়ে উঠার কারণ

নতুন নগর গড়ে উঠার পেছনে রাজনৈতিক কারণ লক্ষ্য করা যায়। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস অনেকটা স্পষ্টতর হয় মূলত ষষ্ঠ শতক থেকে। রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজারা পরিকল্পিত উপায়ে নগর প্রতিষ্ঠা করেন। যেমন: কপিলাবস্তু, বারাণসী, রাজগৃহ, চম্পা, কোশাম্বী প্রভৃতি নগরগুলো। এগুলো গড়ে উঠার পেছনে রাজনৈতিক কারণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। প্রাচীনকালে উত্তর ও পূর্ব-ভারতের রাজারা রাষ্ট্র পরিচালনা করার ক্ষেত্রে বণিকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। নদী অববাহিকা অঞ্চল হওয়ায় বণিকদের

সাথে রাজাদের গভীর সম্পর্ক ছিল। বণিকরা রাজাদের উপর নির্ভরশীল ছিল নিজ নিরাপত্তা, পৃষ্ঠপোষকতার জন্য। অপরদিকে রাজাদের প্রসাশনিক কাজে বণিকরা সাহায্য করতেন। কেনোনা প্রশাসনের ইতিহাস মানব ইতিহাসের মতোই প্রাচীন এবং মানব সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। একথা সত্য যে, কোনো রাষ্ট্রে কোনো নগরই বণিকদের সাহায্য ছাড়া স্থায়ীত্ব লাভ করতে পারে না। পণ্ডিত Gideon Sjoberg মহাশয়ের উক্তিটি প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেন, "কোনো সমাজ তার নিজস্ব রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণানুসারে অর্থনৈতিক ভিত্তির সম্প্রসারণ ঘটায়। ফলে কোনো সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক বিধি-ব্যবস্থা পরিচালনায় কোনো বাণিজ্যিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পক্ষান্তরে, কোনো রাজ্যের অর্থনৈতিক সাফল্য নির্ভর করে মূলত কোনো এক কেন্দ্রীভূত শক্তির উপর; ফলস্বরূপ কোনো নগর এমনকি, বাণিজ্যিক নগরও বিশেষভাবে কোনো রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ সাহায্য ব্যতীত টিকে থাকতে পারে না।"[১৪] এ মূল্যবান উক্তিটি 'সাংকাশ্য' নগরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। পালি সাহিত্যে নগরগুলো সাধারণত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে সৃষ্ট হলেও উভয়ের পেছনে নতুন লৌহ-প্রযুক্তির অবদান ছিলো অপরিসীম। উন্নত নগর সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশে অবদান রেখেছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ। কৃষি ছিলো এ যুগে অর্থনীতির প্রধান অবলম্বন। ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা নগর সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে একথাও সত্য। যেমন-লোহার ব্যবহার মানুষের জীবনযাত্রায় আনে নতুন গতি। পাথরের হাতিয়ারের বদলে লোহার হাতিয়ার ও কৃষি উপকরণ কৃষিক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। এছাড়া অনেক পতিত জমি উদ্ধার করে ফসলাদি উৎপাদনের আওতায় আনা হয়। লৌহ-প্রযুক্তির অবদানের ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদনও অনেক বেড়ে যায়। উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্যের মধ্যে দিয়ে বাণিজ্যের সম্ভাবনা অনেক বৃদ্ধি পায়। উদ্বৃত্ত ফসলের মাধ্যমেই পরোক্ষভাবে নগরের বিকাশ ঘটতে থাকে। পরবর্তীতে এরই পথ ধরে ছোট ছোট রাজ্যের রাজারা রাজ কর্মচারী ও তার সৈন্যদের নিয়ে সংগঠন গড়ে তোলে। খুব সহজেই লৌহ-প্রযুক্তি ব্যবহার করে শাসক শ্রেণির অস্ত্র-শস্ত্রের উন্নতি ঘটে। এসবের ফলশ্রুতিতে শাসকরাও নব উদ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা বাড়ানোর প্রয়োজনে বহু নতুন নতুন নগর প্রতিষ্ঠা করেন। ঐতিহাসিকভাবে জানা যায় বৌদ্ধধর্ম ছিলো ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকূলে। ঐ সময়ে বণিকরা ব্যবসা-বাণিজ্যে অনেক সম্পদশালী হয়ে উঠেন। উল্লেখযোগ্য শিল্পজাত দ্রব্য ছিলো সূতি বস্ত্র, হাতির দাঁতের দ্রব্যসামগ্রী এবং মৃৎশিল্প। নদী তীরবর্তী নগরগুলোর অবস্থান হওয়ায় তখনকার দিনে ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি পেয়েছিল। বাণিজ্য বিকাশের ক্ষেত্র হিসেবে ধাতব মুদ্রার প্রচলন দেখা যায়। বুদ্ধযুগেও ধাতব নির্মিত ছাপাংকিত মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম থেকে শিল্প-বাণিজ্য চর্চা ও অনুশীলনে উৎসাহ লাভ করেছিল। '*সুত্তনিপাত*' গ্রন্থের '*মহামঙ্গলসুত্ত*'তে বলা হয়েছে-"বহুবিধ শিল্প ব্যবসায় জ্ঞানার্জন শ্রেষ্ঠ মঙ্গলজনক কাজ"।[১৫] বৌদ্ধধর্ম কর্মবাদের ধর্ম। এখানে কুশল-অকুশল দুটি কর্মই প্রধান হিসেবে বিভাজিত। বৌদ্ধরা সদা কুশল কর্মে উদ্ভাসিত। সুতরাং বৌদ্ধমতে 'জন্মে নয় কর্মেই আসল পরিচয়'। একটি প্রসিদ্ধ নীতিবাক্য আছে- "যেমন কর্ম তেমন ফল"। আপন জন্মের ব্যাপারে মানুষের নিজের কোনো ভূমিকা থাকে না। এমনকি ধনী বা দরিদ্র পরিবারে জন্ম হওয়াটা মানুষের নিজের ইচ্ছা বা কর্মের উপর নির্ভর নয়। কিন্তু কর্মজীবনে তার ভূমিকা ও অবদানের দায় তার নিজের উপর বর্তায়। তাই পৃথিবীতে মানুষের প্রকৃত বিচারে বংশ পরিচয় তেমন গুরুত্ব বহন করে না। বৌদ্ধ পালি সাহিত্যে *'ব্রাহ্মণ বর্গে'* এর প্রতিধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে এভাবে-

"ন জটাহি ন গোত্তেন ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো,
যম্হি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ সো সুচী সো চ ব্রাহ্মণো।

অর্থাৎ- জটা, গোত্র কিংবা জাতির পরিচয়ে কেউ ব্রাহ্মণ হয় না। যাঁর অন্তরে সত্য ও ধর্ম বিরাজমান তিনিই পবিত্র এবং তিনিই ব্রাহ্মণ।[১৬] জন্ম কোথায় হলো তা দেখার বিষয় নয়। অভিজাত বলে অনেকে বংশ গৌরব বড় করে দেখে, কিন্তু তার কাজকর্মে যদি কোনো গুণ প্রকাশ না পায়, তবে সে বংশ গৌরবের কোনো সম্মান নেই। যেমন সরোবরের শ্যাওলা অপেক্ষা গোবরের পদ্মফুলের মর্যাদা অনেক বেশি। তাই বলা যায় যে, তিনিই পবিত্র যিনি সত্য ও ধর্মের অনুশীলন করেন। আর আজও সত্যধর্ম চর্চাকারীদের কাছে এই 'সাংকাশ্য' বুদ্ধের দ্বিতীয় জন্মস্থান, কারণ তেত্রিশ স্বর্গের সিঁড়ি এখানেই বিশ্বকর্মা নির্মাণ করেছিলেন। যে কেউ চাইলে এই সিঁড়ির পুণ্য মৃত্তিকা মাথায় নিয়ে চলতে পারেন রাজগৃহে। যেখানে বিম্বিসার[১৭] পুত্র অজাতশত্রু[১৮] হিংসা ত্যাগ করে ভগবান তথাগতের পদতলে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন।

৫. সাংকাশ্য নগরে বুদ্ধের অবতরণ

বুদ্ধের মতে প্রত্যেক বুদ্ধমাতা প্রথম সন্তান জন্মের এক সপ্তাহ পরে মৃত্যুবরণ করেন এবং মৃত্যু পরবর্তী তাবতিংস স্বর্গে অবস্থান করেন। একইভাবে গৌতম বুদ্ধের মাতা মহামায়া ও সিদ্ধার্থের (পরবর্তীতে গৌতম বুদ্ধ) জন্মের এক সপ্তাহ পরে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হন। কারণ বুদ্ধমাতার গর্ভে দ্বিতীয় সন্তান আসতে পারেন না। এছাড়াও জগতে এক সাথে দু'জন সম্যক সম্বুদ্ধ উৎপন্ন হন না। একজন মাত্র সম্যক সম্বুদ্ধ উৎপন্ন হন। ভদ্রকল্পের পঞ্চবুদ্ধের মধ্যে বর্তমান চলছে চতুর্থতম বুদ্ধ গৌতম বুদ্ধের শাসন। গৌতম বুদ্ধের শাসন বিলুপ্তির পরে ভদ্রকল্পে[১৯] শেষ বুদ্ধ আর্যমৈত্রীয় বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন। এ সম্পর্কে গৌতম সম্যক সম্বুদ্ধ সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। তিনি বিমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমীর কাছে লালিত পালিত হবেন। এজন্য তাঁকে গৌতম বলা হয়। ক্রমান্বয়ে তিনি ৩৫ বছর বয়সে সম্যক সম্বুদ্ধ ফল লাভ করেন। জগতে বুদ্ধ নামে খ্যাত হওয়ার পর তিনি দিব্যজ্ঞানে মাতৃদেবীর অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত হলেন। মাতাকে দুঃখমুক্তি দানের মানসে বুদ্ধ তাবতিংস স্বর্গে গমন করলেন শুভ আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে। সেখানে তিনমাস অবধি অভিধর্ম পিটক (চিত্ত ও চৈতসিক সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা) দেশনা করে মাতাকে মুক্তিমার্গ দান করেছিলেন। সাথে অসংখ্য দেব ব্রহ্মও ধর্মচক্ষু লাভ করেছিলেন। অতঃপর বর্ষাবাসের পরে তথাগত বুদ্ধ স্বর্গলোক থেকে মর্ত্যলোকে অবতরণ করেছিলেন। সেদিন ছিল শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা। আর সেটি ছিল বুদ্ধের জীবনের সপ্তম বর্ষাবাস। মর্ত্যলোকে অবতরণের সময়ও এক অবিনাশী স্মৃতি সমৃদ্ধ ঘটনা ঘটে যায়। বুদ্ধ তাবতিংস স্বর্গে বর্ষাবাস যাপনকালে মাতৃদেবীকে উদ্দেশ্য করে ধর্মদেশনা করলেও পরে সেই দেশনাবলি ছিল দেব উপযোগী। সেই দেশনায় অসংখ্য দেব ব্রহ্মা ধর্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন। তখন দেব পরিষদ চিন্তা করলেন তারা কিভাবে বুদ্ধের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারেন।

বৌদ্ধ কিংবদন্তী মতে, বিশ্বকর্মা দেবপুত্র বুদ্ধের সম্মানে দৈব শক্তিতে তাবতিংস স্বর্গ থেকে ভারতের 'সাংকাশ্য' নগর পর্যন্ত তিনটি স্বর্গীয় সিঁড়ি রচনা করলেন। মধ্যখানের সিঁড়ি ছিল মুণিমুক্ত খচিত, বামপাশের সিঁড়ি ছিল রোপ্য খচিত এবং ডানপাশের সিঁড়ি ছিল স্বর্ণ খচিত। বুদ্ধ মাঝখানের সিঁড়ি দিয়ে দেবলোক হতে মর্ত্যলোকে অবতরণ করেছিলেন।[২০] বামপাশের সিঁড়ি বেয়ে দেবগণ বুদ্ধের প্রতি দিব্যপুষ্প বর্ষণ করতে করতে সাধু সাধু ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে বুদ্ধের গুণকীর্তন করেছিলেন। সেদিন স্বর্গ-মর্ত্য একাকার হয়ে গিয়েছিল। সেদিন ছিল এমন এক বিরল এবং দুর্লভ সময় সন্ধিক্ষণ যেই ক্ষণে দেবতা এবং মানুষ সরাসরি পরস্পরকে দর্শন করার সুযোগ লাভ করেছিলেন।

ত্রয়োস্ত্রিংশ দেবতাদের স্বর্গলোক হতে বুদ্ধের মর্তে (সাংকাশ্যে অবতরণ প্রস্তর ভাস্কর্য-সাঁচী। (প্রায় খৃ: পূ: দুই-শতক)।[১৩]
চিত্র-১

তথাগত উপলব্ধি করতে পেরেছেন ভোগের মধ্যেই সুখ নিহিত নয়। কেননা সুখপ্রয়াসী সাধারণ মানুষ নিরন্তর ভোগের উপকরণ সংগ্রহেই মত্ত থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় ভোগপ্রবণতা মানুষকে বিলাসী, কর্মবিমুখ ও স্বার্থপরে পরিণত করে। তারপর ভোগের ক্ষমতাও লোপ পায়। যথার্থ সুখ পরিভোগ প্রবণতার মধ্যে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় নিরন্তর কাজের মধ্যে, দেশব্রতী ও মানবব্রতী ভূমিকার মধ্যে। তখন তিনি উপলব্ধি করলেন- উদঘাটিত হয়েছে জগতের সৃষ্টি রহস্য, পরিজ্ঞাত হয়েছে জগতের মূল তত্ত্ব, উন্মোচিত হয়েছে পরম সত্য। জগতের সকল তত্ত্ব, তথ্য অধিগত করে তিনি লাভ করেছেন সর্বজ্ঞতা, হয়েছেন সম্বুদ্ধ। সর্বোপরি তিনি নির্মূল করে হয়েছেন জন্ম-মৃত্যুর অতীত।[১৪] জন্ম-জন্মান্তরের সাধনায় নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্বক পারমিতাসমূহ পূর্ণ করে সম্বোধি লাভ করার ফলে যখন 'বুদ্ধ' হলেন তখন আনন্দোচ্ছ্বাসে বললেন-

"অনেকজাতিসংসারং সন্ধাবিস্সং অনিব্বিসং,
গহকারকং গবেসন্তো দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং,
গহকারকং! দিটঠোসি পুন গেহং ন কাহসি,
সব্বাতে ফাসুকা ভগ্গা গহকূটং বিসঙখিতং,
বিসঙ্খারগতং চিত্তং তণ্হানং খযমজ্ঝগা।"[১৫]

অর্থাৎ- দেহরূপ গৃহের নির্মাতাকে সন্ধান করতে গিয়ে (যথার্থ জ্ঞানাভাবে) তাকে না পেয়ে বহু জন্ম-জন্মান্তর সংসারে পরিভ্রমণ করেছি। বার বার জন্মগ্রহণ করে বহু দুঃখভোগ করেছি। হে গৃহকারক! এবার আমি তোমার সন্ধান পেয়েছি। পুনরায় তুমি আর গৃহ নির্মাণ করতে পারবে না। তোমার গৃহের সমস্ত উপকরণ ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছি। আমার সংস্কারমুক্ত চিত্ত সমুদয় তৃষ্ণার ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে।

বুদ্ধত্ব লাভোত্তর অষ্টম সপ্তাহে বারাণসীর মৃগদাবে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুর কাছে প্রথম 'ধর্মচক্র প্রবর্তন' সূত্রের দেশনা করলেন। দেশনার ফলে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের মধ্যে অন্যতম কোণ্ডিণ্যের পাপরাজি মুক্ত ও পাপ মলবিহীন হয়ে ধর্মচক্ষু প্রস্ফুটিত হলো। অপর চারজনও মার্গফলাদি লাভ করে অর্হৎ ফল লাভ করেন। বুদ্ধের প্রথম ধর্মোপদেশে এ পাঁচজনই তাঁর প্রধান শিষ্য। তিনি সেদিন সেই ধর্ম প্রথম প্রচার করেন সেটি ছিল বিশ্বের সর্বদেশের সর্বকালের হিতার্থে, কল্যানার্থে, সুখার্থে বুদ্ধলব্ধ সত্যধর্ম তিনি তাঁর শিষ্যদের প্রথম যে দেশনা দিয়েছিলেন, সেখানে আরও বলা হয়েছে- সেই ধর্ম আদিতে, মধ্যে ও অন্তে কল্যাণকর সেই পরিশুদ্ধ পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্যধর্ম প্রচার কর। গাথাটি নিম্নরূপ:

'চরথ ভিক্খবে চারিকং বহুজন হিতায, বহুজন সুখায,
লোকানুকম্পায, অত্থায হিতায, সুখায, দেব মনুস্সানং
... দেসেথ ভিক্খবে ধম্মং আদি কল্লাণং,
মজঝে কল্লাণং, পরিযোসান কল্লাণং ... পকাসেথ'[৯]

উপরোক্ত তিনটি ঘটনা ছাড়াও এ তিথিতে বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে যমক প্রতিহার্য (অলৌকিক শক্তি) প্রদর্শন করেছিলেন এবং মাতৃদেবীকে ধর্মদেশনা করার জন্য ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে গমন করেছিলেন।

আবার *'কণহজাতক'* (৪৩৭), *'ধম্মপদট্ঠকথা'* হতে জানা যায়, তথাগত বুদ্ধ শুভ আষাঢ়ী পূর্ণিমায় তাবতিংস দেবলোক থেকে সিনেরু পর্বত অতিক্রম করে দেবরাজ প্রদত্ত সোপানে করে এই নগরে অবতরণ করেন। আর সিনেরু পর্বতের অবস্থান হলো চক্রবালের মধ্যভাগে। সপ্ত সমুদ্র ও সপ্ত পর্বত দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং সেখানে বসবাসকারী অধিবাসীদের পরমায়ু পঞ্চশত বছর। সিনেরু পর্বতের উচ্চতা চুরাশী হাজার যোজন। ছয়টি স্বর্গের মধ্যে প্রথম স্বর্গ হলো চতুম্মহারাজিক স্বর্গ। এই স্বর্গের পূর্বদিকে পূর্ববিদেহ নামক মহাদ্বীপ, দক্ষিণ দিকে জম্বুদ্বীপ, পশ্চিমদিকে অপরগোয়ান এবং উত্তরভাগে উত্তরকুরু। বিয়াল্লিশ হাজার যোজন উচ্চে যুগন্ধর পর্বতের মাথায় এই স্বর্গের অবস্থান। আর এই যুগন্ধর পর্বতের সুউচ্চ দিক নিয়ে চন্দ্র-সূর্য সিনেরুর চারপাশে পরিভ্রমণ করে থাকে।

ছয়টি স্বর্গের মধ্যে প্রথম স্বর্গ সম্পর্কে আমরা আগেই জেনেছি। আরো পাঁচটি স্বর্গ হলো তাবতিংস স্বর্গ, যাম স্বর্গ, তুষিত স্বর্গ, নিম্মাণরতি স্বর্গ ও পর নিম্মিত বসবত্তী স্বর্গ। উপরোক্ত ছয়টি স্বর্গের মধ্যে দ্বিতীয় স্বর্গ যেখানে বুদ্ধ তার মাতাকে ধর্মদেশনা প্রদান করেছিলেন। সেই তাবতিংস স্বর্গের অধিপতি ছিলেন দেবরাজ ইন্দ্র। এই দেবলোকে দ্বিহেতুক পৃথগজন, ত্রিহেতুক পৃথগজন ও অষ্ট আর্য্যপুদগল এই দশ শ্রেণির ব্যক্তিগণ জন্মগ্রহণ করে থাকেন। আমাদের একশত বৎসরে তাবতিংস স্বর্গের এক দিন-রাত্র। স্বর্গলোকবাসীদের গণনায় তাদের পরমায়ু এক হাজার বছর, কিন্তু মনুষ্য গণনায় তিনকোটি ষাট লক্ষ বৎসর। তাবতিংস স্বর্গ আমাদের এই পৃথিবীর সাথে সংলগ্ন।[১০]

মানুষেরা প্রায়শঃ মৃত্যুর পর এবং এমন কি কখনো কখনো মর্ত্যলোকে জীবিতকালে যে স্বর্গ পরিভ্রমণ করতেন পালি সাহিত্যে এ সম্পর্কিত অনেক গল্প, উপাখ্যান উক্ত হয়েছে। *'নিমি জাতকে'*[১১] বর্ণিত হয়েছে যে, রাজা নিমি স্বর্গে গিয়েছিলেন এবং নিম্নোক্ত দৃশ্যগুলো প্রত্যক্ষ করেছিলেন। দৃশ্যগুলো হলো:

১. বীরনী বিমান বৃক্ষ, পুষ্প, কল্পবৃক্ষ, পুষ্করিণী প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ একটা উদ্যান।
২. সোণদিন্ন দেবপুত্রের সপ্তস্বর্ণ বিমান।
৩. ফলিকবিমান।
৪. মণি বিমান ও
৫. বেলুরিয়বিমান।

তিনি সুমেরু পর্বতে গমন করেন এবং সপ্ত পর্বত বেষ্টিত চতুম্মহারাজিক দেবগণের আবাস স্থান সুমেরু পর্বত দর্শন করেন। সেখানে থেকে তিনি তাবতিংস দেবলোকে ইন্দ্রের মূর্তি দর্শন করেন। সেখান থেকে তিনি সুনির্মিত সুচিক্কণ সুন্দর অষ্ট অংশে বিভক্ত স্তম্ভযুক্ত দেবগণের সন্থাগারে গমন করেন। ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবগণ নিমিকে সংর্বধনা জানাতে আগমন করেন এবং দেবগণের প্রধান ইন্দ্রের পাশে তাঁকে আসন প্রদান করা হয়।

৬. পরিব্রাজকদের দৃষ্টিতে সাংকাশ্য এবং এর প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ

ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে বৌদ্ধ পুণ্যতীর্থসমূহ বিশেষ স্থান দখল করে রয়েছে। এখানে দেশ-দেশান্তর হতে অসংখ্য পর্যটক ছুটে এসেছে অনেক আশা নিয়ে। পর্বতগাত্রে,

শিলালেখে তার প্রতিধ্বনি এখনো বর্তমান। নিম্নোক্ত পর্যটকরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভ্রমণ কাহিনীতে তাঁদের দেখা নগরের বিবরণ রেখে গেছেন। তাঁরা ছুটে বেড়িয়েছেন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। তাঁদের সেসব অভিজ্ঞতার কথা লিখে গেছেন পুঁথিতে। সেকারণে পর্যটকদের ভ্রমণ কাহিনীগুলো ইতিহাস-ঐতিহ্য আবিষ্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন 'সাংকাশ্য' নগরে তথাগত বুদ্ধের স্বর্গ থেকে অবতরণ স্থানে সম্রাট অশোকের তৈরি একটি বিহার দেখেন। এছাড়াও বহু স্তূপ মন্দির এবং ১৬ হাত উচ্চতা বিশিষ্ট একটি বুদ্ধমূর্তি লক্ষ্য করেন। তিনি বিহারগুলোতে অসংখ্য ভিক্ষু বসবাস করতে দেখেছিলেন।[২৭] সেখানে বুদ্ধমন্ত্রে সর্বত্র মুখরিত ছিল। অবিরত সেই মন্ত্র উচ্চারিত হত। বিহারগুলো ধর্ম ও শাস্ত্রালোচনার কেন্দ্র ছিল। শুধু ধর্ম নয় জ্যোতিষ, আয়ুবেদ, চিত্রকলা ও ভাস্কর্য প্রভৃতি সকল প্রকার পরা ও অপরা বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করতেন। যেমন বলা যায়, নদীতে যখন জোয়ার আসে তখন খাল, বিল, নালা সমস্তই জলে পূর্ণ হয়ে যায়; বৌদ্ধধর্মের অমৃতরসও সেরূপ জোয়ারের মত ভারতবর্ষকে প্লাবিত করেছিল। আর সেই প্লাবন শুধু ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি অন্য দেশেও পরিব্যাপ্ত হয়েছিল।

হিউয়েন সাং এর বিবরণী সপ্তম শতকের ভারত ইতিহাসের এক ঐতিহাসিক দলিল। তিনি ভারতবর্ষের অনেক রাজ্য ভ্রমণ করেন, বৌদ্ধশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর অভিজ্ঞতাসমূহ লিপিবদ্ধ করেন। তিনি হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ভারত পরিভ্রমণ করেন। হিউয়েন সাং তাঁর শাসন ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি একজন উদার ও প্রজাহিতৈষী শাসক ছিলেন। ধর্ম, শিক্ষা ও সাহিত্য এবং শাসন ব্যবস্থা প্রভৃতি কর্মের মধ্যে তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে দ্বিতীয় চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং 'সঙ্কস্স' পরিদর্শন করেন। এই নগরকে তিনি একটি দেশ রূপে উল্লেখ করেন। সীমানা নির্ধারণ করেন মাত্র ২০০ লি (প্রায় ৩৩৩ মাইল)। এতে মনে হয় পরিব্রাজক নগরটির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোও তাঁর পরিমাপের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাজধানীর বিস্তৃতি নির্ধারণ করেন মাত্র ২০লি (প্রায় ৩.৫০ মাইল)। বিহার প্রাঙ্গণে আছে তিনটি সিঁড়ি, পূর্ব থেকে পশ্চিমে ঢালু হয়ে নেমে গেছে। মাঝখানের সিঁড়ি স্বর্ণ নির্মিত, বাম পাশেরটা স্ফটিকের ও ডান পাশেরটা রৌপ্য নির্মিত ছিল। বুদ্ধ ত্রয়স্ত্রিংশস্বর্গে মাকে ধর্মদেশনা করেন, মধ্যের সিঁড়ি দিয়ে জম্বুদ্বীপে নেমে এসেছিলেন। ব্রহ্মা একটি সাদা ঝালর ধরে রৌপ্যের সিঁড়ি দিয়ে ও ইন্দ্র একটি মূল্যবান ছাতা ধরে স্ফটিকের সিঁড়ি দিয়ে বুদ্ধের সাথে এসেছিলেন। বুদ্ধের পিছনে পিছনে আরো অনেক দেবতা ও বোধিসত্ত্বরা নেমে এসেছিলেন। ঘটনাটি স্মরণীয় করে রাখার জন্য কয়েকশত বছর ধরে রাজন্যবর্গ বিভিন্ন সময়ে ইটপাথর দিয়ে সিঁড়ি বাঁধিয়ে এর রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। ইটপাথরের সিঁড়ি মণিমুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা ছিল। হিউয়েন সাং ৭০ ফুট সিঁড়ি দেখেছিলেন। সিঁড়ির উপর মন্দির নির্মাণ করে স্বর্গ থেকে নেমে আসা বুদ্ধ, ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল। তাছাড়া যে স্থান থেকে বুদ্ধ স্বর্গে গিয়েছিলেন ও ফিরে এসেছিলেন সে স্থানে সম্রাট অশোক সাত ফুট উঁচু পাথরের বেদীর উপর ৭০ ফুট উঁচু পাথরের একটি পিলার স্থাপন করেছিলেন। হিউয়েন সাং এই নগরে বহু বিহার ও দেব-দেবীর মন্দির লক্ষ্য করেন।[২৮] সত্যিই শিল্পকর্মের কী এক মহান ঐতিহ্য। ভ্রমণবিলাসীদের মন জয় করে নেয়।

উল্লেখিত বিবরণাদির ভিত্তিতে কানিংহাম 'সংকিস' (সাংকাশ্য) বসন্তপুর নামক গ্রামকে একটি নগর রূপে অভিহিত করেন। এই গ্রামটি বর্তমান খিলান নামে খ্যাত। যার পরিমাপ হলো ৪০০ মি. x ৩০০ মি. x ১২ মি. এটি একটি ঢিবির উপর অবস্থিত। এর প্রায় ২৮৮ মি. উত্তরে ইটের মন্দিরের অন্য একটি ঢিবি রয়েছে। এছাড়াও মন্দির ঢিবি থেকে ১২২ মি. দূরে মৌর্য সম্রাট অশোকের একটি স্তম্ভ রয়েছে। উত্তর প্রদেশে এসেছিলেন তখন এখানে প্রায় ৫ কি.মি.

সীমানাব্যাপী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখেছিলেন। পূর্ব, উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিকের তিনটি তোরণও আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানকার মাটির তৈরি সিলমোহরগুলোকে খ্রি.পূ. ২০০ অব্দের বলে মনে করা হয়। 'সংকিসে' (সাংকাশ্যে) আবিষ্কৃত অন্যান্য মূল্যবান প্রত্নবস্তুর মধ্যে আহত মুদ্রা, ছাপাংকিত তাম্রমুদ্রা এবং ইন্দেসিথিয়ান রাজা ও মথুরা শত্রুপদের মুদ্রা, ভিক্ষুণী উৎপলার প্রতিকৃতিসহ একটি সিঁড়ির খোদিত একটি শীলালেখ, মহাপরিনির্বাণ শয্যায় শায়িত বুদ্ধের একটি কালপাথরের মূর্তি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[৯] মূলত গৌতম বুদ্ধের স্তুতি জনচিত্তে জাগ্রত রাখার জন্য বৌদ্ধ শিল্পের সৃষ্টি।

'সাংকাশ্য' নগরে একটি বিশাল জলাধার বা পুষ্করিণী রয়েছে। এখানকার স্থানীয় অধিবাসীরা 'কারেয়ার নাগ-দেবতা' নামে পূজা করেন। সাংকাশ্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শৈব সম্প্রদায়ের বহু ভক্ত ও দশটি মন্দিরের কথা উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও এখানে চারটি বিহারে প্রায় এক হাজার শ্রমণকে বাস করতে দেখেছেন চীনা পরিব্রাজকরা। পরিব্রাজকরা তাঁদেরকে সম্মিতীয় সম্প্রদায়ে বলে মনে করেন। অন্যান্য বিস্তীর্ণ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কিছু মন্দির রয়েছে, মন্দিরগুলো দেখতে অত্যন্ত মনোরম ও আকর্ষণীয় এবং এতে বিসারা দেবীর মূর্তি রয়েছে। প্রত্যেক আষাঢ়ী পূর্ণিমায় এখানে মেলা হয়। এছাড়াও এখানে কয়েকটি ঢিবি রয়েছে। স্থানীয় লোকদের কাছে 'কিল্লা' নামে পরিচিত এই ঢিবিগুলো। ঢিবিগুলোর কয়েকটিতে খননকার্য চালিয়ে বেশ কিছু ব্রাহ্মণ্যধর্মের তৈরি ভাস্কর্য ও অন্যান্য প্রত্ন-সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। মথুরার বেলে পাথরের তৈরি (প্রায় খৃ. এক শতক) একটি প্রাকার স্তম্ভও পাওয়া গেছে।[১০]

বৌদ্ধ স্থাপত্যকর্মের প্রাচীন ও সুন্দরতম উন্নতির নিদর্শন হলো ভারহুত ও সাঁচী স্তূপ। অতীত ঐশ্বর্য্যের স্বরূপের কারণে আজও সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। ভারহুত স্তূপের ন্যায় সাঁচী স্তূপটিও তৎকালীন বণিক ও উপাসক শ্রেণির দানে কালে কালে সমৃদ্ধ ও বিবর্ধিত হয়। এখানকার মঠ, চৈত্য, তোরণ, স্তম্ভ প্রভৃতিতে অপূর্ব সব ভাস্কর্যের মাধ্যমে জাতকের কাহিনী ও বুদ্ধের জীবনের ঘটনাবলী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ভারহুত ও সাঁচীতে বুদ্ধের শরীর ভাস্কর্যে নির্মিত হয়নি। এখানে বিভিন্ন প্রতীকের মাধ্যমে তা প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন- চক্র, স্তূপ, ঘোড়া, বোধিবৃক্ষ, পায়ের ছাপ ও ছাতা ইত্যাদি। এখানে চক্রের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে তাঁর প্রথম ধর্ম প্রচারকে, বোধিবৃক্ষ দিয়ে বুঝানো হয়েছে তাঁর জ্ঞানলাভকে। এই ঐতিহাসিক বৃক্ষের নিচে বসেই শাক্যকুমার সিদ্ধার্থ মারকে পরাজিত করে সম্বোধি জ্ঞান লাভ করে জগতে বুদ্ধ নামে খ্যাত হন। স্তূপের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে বুদ্ধের পরিনির্বাণের কথা। ঘোড়া দ্বারা তাঁর রাজপ্রসাদ থেকে সন্ন্যাস যাত্রাকে বুঝানো হয়েছে। শূন্য সিংহাসন ও ছাতা দ্বারা বুদ্ধের উপস্থিতি বুঝানো হয়েছে।[১১] ভারহুত ও সাঁচী স্তূপের উত্তরদিকে তোরণের গায়ে তথাগত বুদ্ধের তেত্রিশ স্বর্গ হতে অবতরণের দৃশ্য খোদিত রয়েছে। সাতবাহন যুগে তোরণটি নির্মিত হয়েছিল। ভারহুত নিবি-কা-কোট নামে পরিচিত বৌদ্ধযুগের ধ্বংসাবশেষ অনেকটা স্থান নিয়ে রয়েছে। নিবি-কা-কোট নামে পরিচিত অপর একটি মন্দির ঢিবির প্রায় ১৮৩ মি. পূর্বে অন্য একটি ঢিবি রয়েছে যাকে বিহার বলে মনে করা হয়। এছাড়াও উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে বহু সংখ্যক স্তূপের ঢিবিও লক্ষ্য করা যায়। এসব ঢিবি নিয়ে গঠিত সমগ্র নগরটি ৩৮৯ মি. বিস্তৃত এক প্রতিরক্ষা প্রাচীরে ঘেরাও ছিল।[১২] অনেকে মনে করেন এই নিবি-কা-কোট নামক স্থানে বুদ্ধ দেবলোক থেকে মর্ত্যলোকে অবতরণ করেছিলেন। নিবি-কা-কোট মূলত এই 'সাংকাশ্য' নগরেই অবিস্থত।

ভারহুতে সাংকাশ্যের বংশধর।[৩]
চিত্র-২

গান্ধারে গ্রীক-বৌদ্ধ শিল্পে সাংকাশ্যের বংশধর।[৩]
চিত্র-৩

বুদ্ধ সাংকাশ্যতে প্রচার করছেন।[৩]
চিত্র-৪

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) 'শরণ' কবিতায় বৌদ্ধ ভারতের অতীত স্মৃতি রোমন্থন করা হয়েছে। কেনোনা মহাকালের অতীতকে কখনো ভুলে যাওয়া বা অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই। অতীতের প্রভাব বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপর পড়ে। মহাকাল অনাদি, অনন্ত এবং নিরবচ্ছিন্ন। অতীত থেকে শিক্ষা নিয়েই প্রত্যেক জাতিই তাদের জীবনের জয়গাঁথা নিয়ে অগ্রসর হয়। ইতিহাসের শিক্ষা মানুষকে সঠিক পথ চলার নির্দেশনা দেয়। মানব জীবনে অতীতের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। বর্তমান সভ্যতা, সংস্কৃতি ও রীতিনীতির পেছনে রয়েছে অতীত নিদর্শনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। মানুষ যখন নিজ নিজ অস্তিত্ব হারাতে বসে, তখন পথ নির্দেশনা স্বরূপ আকঁড়িয়ে ধরে আপন অতীত ইতিহাসকে। অতীত হলো সমাগত বর্তমানে উত্তরণের সিঁড়ি এবং অনাগত ভবিষ্যতের পথ পরিক্রমার সেতুবন্ধন। তাই বুদ্ধের আড়াই হাজার বছরের ইতিহাস মুছে ফেলা যায়নি। তাঁর জীবনের নানা ঘটনার সাথে যেসব স্থান জড়িয়ে আছে সেখানকার নিদর্শনসমূহ বিশ্ববাসীকে আজও আকৃষ্ট করে। লৌকিক দৃষ্টিতে অতীত অতীতই,

কিন্তু কবির কাছে অতীত মানে অবলুপ্তি নয়। অতীত বিরাট মহীরুহের ন্যায় কর্ম, জ্ঞান ও কৃষ্টি নিয়ে মানুষের উপর ধীর মন্থর গতিতে তার কাজ করে যাচ্ছে। তাই কবি লিখেছেন-

দেশ-দেশান্তর হতে ভারতের মন্দির প্রাঙ্গণে
অগণিত তীর্থযাত্রী স্মরণের পুণ্য মহোৎসব
এসেছ কি আশা লয়ে, কি মহান স্মৃতির বন্ধনে!
কালের চরণক্ষেত্র সমাকীর্ণ বিস্মৃতির শবে-
আশাহীন মরুভূমি।[৩৬]

৭. ঐতিহাসিক স্থান দর্শনের গুরুত্ব

মনে আনন্দময় অনুভূতির সঞ্চার করা ছাড়াও জীবনে ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের তাৎপর্য রয়েছে। যেকোনো ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের দ্বারা মানুষ মুখোমুখি হয় অতীত ইতিহাসের ফেলে যাওয়া নিদর্শনসমূহের। এমন নিদর্শনের ইতিহাসের সাথে মানুষের পরিচয় ঘটানোর মাধ্যমে অতীতের সাথে বর্তমানের যোগসূত্র রচনা করে। ঐতিহ্য বা ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের মাধ্যমে মানুষ ইতিহাসকে হাতে ছুয়ে দেখতে পারে। সে ইতিহাস হতে পারে ধর্মীয় ইতিহাস বা অন্য যেকোনো ইতিহাস।

মানবজীবন একটি অনন্ত ভ্রমণের অংশবিশেষ। তীর্থস্থান তথা ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমন একটি আনন্দময় পুণ্য এবং জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞাতার উৎসও বটে। ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের মাধ্যমে পূর্ববর্তীদের কীর্তি সম্পর্কে জানা এবং শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হয়। আবার এভাবেও বলা যায় তীর্থযাত্রা নৈতিক অথবা আধ্যাত্মিক তাৎপর্য অনুসন্ধানের যাত্রা। সাধারণত, এটি ব্যক্তির আস্থা, ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মবিশ্বাসকৃত স্থানের জন্য যাত্রা। যদিও কখনও এটি কারো ব্যক্তিগত বিশ্বাসের মধ্যে রূপক যাত্রা হতে পারে।

তীর্থ, মহাতীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থান দর্শনের অনেক গুরুত্ব নানাভাবে প্রতীয়মান হয়। তীর্থস্থান ও মহাতীর্থস্থান ভ্রমণ করা একটি পূণ্যকর্মেরই অংশ। ধর্ম পালন করা যেমন কর্তব্য তেমনি এগুলো দর্শন করাও পবিত্রকর্ম ও কর্তব্য। ধর্মপ্রাণ নরনারীগণ বিভিন্ন সময়ে এ সব দর্শনীয় স্থান ভ্রমণে যেয়ে থাকেন। তীর্থস্থান ও মহাতীর্থস্থান ভ্রমণে ধর্মের প্রতি আগ্রহ বাড়ে এটিই সত্য। এতে মন পবিত্র হয় ও ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগরিত হয়। তীর্থস্থান ও মহাতীর্থস্থানে নানা দেশের লোক সমাগম ঘটে থাকে। তাঁদের সাথে মেলামেশা ও চলাফেরার সুযোগ ঘটে। যার ফলে সকলের মধ্যে মৈত্রীভাব গড়ে উঠে। এগুলো দর্শনের ফলে মানুষের দুঃখ খণ্ডন ও অকুশল পরিহার হয়ে থাকে। আবার ভ্রমণের মধ্যে দিয়ে মানুষের জ্ঞান পরিপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে যে যত বেশি ভ্রমণ করবে তার জ্ঞান ততো বেশি বৃদ্ধি পাবে। ঐতিহ্য ও ধর্মীয় ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের মধ্যে দিয়ে মনের পবিত্রতা সৃষ্টি, পুণ্য অর্জন ও আত্মবিশ্বাসী হওয়া সম্ভব। তাই সবার তীর্থস্থান, মহাতীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থানসমূহ দর্শন করা উচিত। আর 'সাংকাশ্য' এমন একটি ভ্রমণের ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক স্থান হিসেবেই বৌদ্ধধর্মালম্বী জনগোষ্ঠি ও পর্যটকদের নিকট গুরুত্ব পেয়েছে।

৮. অর্থনৈতিক উপযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক বন্ধন

ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ঐতিহ্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্যসমূহ যেমনি প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ, তেমনি অর্থনৈতিক সম্পদও। একটি বৌদ্ধ তীর্থস্থান একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। আবার এটি পর্যটনস্থানও। কারণ বৌদ্ধধর্মালম্বীরা ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ এখানে বৌদ্ধ তীর্থস্থানের পাশাপাশি পর্যটনস্থান হিসেবে পরিভ্রমণ করে থাকেন। সকল ধর্মের সকল প্রকার প্রাচীন তীর্থস্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব রয়েছে। এগুলো প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে যেভাবে চিন্তা করতে পারি এবং

সংজ্ঞায়িত করে থাকি ঠিক সেটি প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ। বুদ্ধগয়া, নালন্দা, রাজগীর, শ্রাবস্তী, কুশিনগর কিংবা অজন্তা-ইলোরার মত সাংকাশ্যও একটি মহামূল্যবান পর্যটন সম্পদ। ঠিক একইভাবে পর্যটকের দৃষ্টিতে এসব ঐতিহ্য ও পর্যটনস্থান বা পর্যটন শিল্প হিসেবে পরিগণিত। কারণ সময়ের পরিক্রমায় পৃথিবীর অনেক কিছুর পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং হচ্ছে। তবে তাতে মূলতত্ত্বের কোনো পরিবর্তন, মর্যাদা ও ধর্মীয় গুরুত্ব হারায় না। এ কারণে 'সাংকাশ্যকে'ও ঐ অর্থে পর্যটন শিল্পও বলা যেতে পারে। পর্যটন শিল্প পৃথিবীর একক বৃহত্তম শিল্প হিসেবে স্বীকৃত। পর্যটনের গুরুত্ব সর্বজনীন। পৃথিবীর প্রায় সব দেশে পর্যটন এখন অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার খাত। ১৯৫০ সালে পর্যটকের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৫ মিলিয়ন; যা ২০১৬ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১২৩৫ মিলিয়নে।

২০১০ সালে ৯৪০ মিলিয়নেরও অধিক আন্তর্জাতিক পর্যটক বিশ্বব্যাপী ভ্রমণ করেন। ২০০৯ সালের তুলনায় এ সংখ্যা ৬.৬% বেশি ছিল।[৩৭] ২০১০ সালে আন্তর্জাতিক পর্যটনে ৯১৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ৬৯৩ বিলিয়ন ইউরো আয় হয়েছিল। যা ২০১৯ সালে প্রায় ১.৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয়েছিল, যা ইতিহাসে সর্বোচ্চ। তবে ২০২০ সালে করোনা মহামারিতে এই শিল্প থেকে আয় ৫৩৩.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে নেমে আসে।[৩৮]

ধারণা করা হচ্ছে, এ বছর প্রায় ১৩৯ কোটি ৫৬ লাখ ৬০ হাজার পর্যটক সারা পৃথিবী ভ্রমণ করবেন। অর্থাৎ বিগত ৬৭ বছরে পর্যটকের সংখ্যা প্রায় ৫০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পর্যটকের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে এ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিধি ব্যাপকতা লাভ করেছে। পর্যটনের মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধিত হয়ে থাকে। ২০১৭ সালে বিশ্বের জিডিপিতে পর্যটনের অবদান ছিল ১০.৪ শতাংশ, যা ২০২৭ সালে ১১.৭ শতাংশে গিয়ে দাঁড়াবে। এছাড়া ২০১৭ সালে পর্যটকদের ভ্রমণখাতে ব্যয় হয়েছে ১৮৯৪.২ বিলিয়ন ডলার। আর একই বছর পর্যটনে বিনিয়োগ হয়েছে ৮৮২.৪ বিলিয়ন ডলার। পর্যটনের উন্নয়নের একটি খণ্ডচিত্র আমরা এর থেকে পেতে পারি।[৩৯] বৌদ্ধ তীর্থস্থান, প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ ও পর্যটন খাত বা শিল্প হিসেবে 'সাংকাশ্য'কেও এ হিসেবের বাহিরে রাখা যায় না। কারণ বাংলাদেশ ও ভারতের বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীসহ চীন, জাপান, থাইল্যান্ড, লাওস, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, শ্রীলংকা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর পর্যটকরা প্রতি বছর 'সাংকাশ্য'সহ বৌদ্ধতীর্থস্থানগুলি পরিদর্শন করেন।

ভারতে বৌদ্ধধর্ম প্রথমে সিংহলে (শ্রীলংকা) এবং পরে অন্যান্য দেশে পৌঁছেছে আর এর ফলে অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, সামাজিক এবং ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে উঠে। রাষ্ট্রপতি রাম নাথ কোবিন্দ নতুন দিল্লিতে আয়োজিত আন্তর্জাতিক বৌদ্ধধর্ম সম্মেলনে যথার্থই বলেছেন যে, ভারত থেকে বিশ্বজুড়ে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার বিশ্বায়নের প্রথম ভিত্তি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০২০ সালের ১৫ অগাস্টে জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর ভাষণে বলেন, আমাদের সামুদ্রিক প্রতিবেশী আসিয়ান দেশগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক এবং আধ্যাত্মিক সম্পর্ক বজায় রাখতে বৌদ্ধধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভারতের সঙ্গে এই সমস্ত দেশের হাজার বছরের পুরনো ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রয়েছে এবং বৌদ্ধ ধর্মের ঐতিহ্যগুলো তাদের সাথে আমাদের সংযুক্ত করে।

যদিও ভারত বৌদ্ধধর্মের আবাসস্থল তবুও মনে করা হয় যে, বিশ্বের বৌদ্ধ পর্যটকদের কেবলমাত্র একটি ছোট অংশই এখানে আসে। বিশ্বমানের বৌদ্ধ পরিমন্ডল ছাড়াও, বিদেশ থেকে আরো বেশি তীর্থযাত্রী এবং পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্য ভারত বড় ধরনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রস্তুত রয়েছে। আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশও বৌদ্ধ ঐতিহ্যের পীঠস্থান। পাল রাজাদের চারশত বছরের ইতিহাসে এসব ঐতিহ্য ছিল অত্যন্ত গৌরবের। যেমন পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার, ময়নামতি শালবন বিহার, বগুড়ার মহাস্থানগড়, চট্টগ্রামের

পণ্ডিত বিহারসহ অসংখ্য স্থাপনা। এমনকি বিক্রমপুরের অতীশ ভিটা, নরসিংদীর ওয়ারি বটেশ্বর এবং খুলনা-যশোরের ভরত ভায়না প্রভৃতিও প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ।

উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ভারতের 'সাংকাশ্য' তথা 'সাংকাশ্য নগরী' এখন পর্যন্তও বৌদ্ধদের জন্য পবিত্র তীর্থস্থান হয়ে আছে এবং *'ত্রিপিটকে'* উল্লেখ রয়েছে প্রত্যেক সম্যক সম্বুদ্ধ তাবতিংস স্বর্গ থেকে উক্ত 'সাংকাশ্য' নগরে অবতরণ করবেন। এটিকে অপরিবর্তনীয় স্থান বলা হয়। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, 'সাংকাশ্য' বৌদ্ধধর্মের 'অষ্টমহাতীর্থস্থানের' অন্যতম একটি। আর 'অষ্টমহাতীর্থস্থানের' মধ্যে অন্যান্যগুলো হলো- লুম্বিনী, বুদ্ধগয়া, সারনাথ, কুশীনগর, রাজগৃহ, বৈশালী ও শ্রাবস্তী। এছাড়াও বৌদ্ধ ঐতিহ্যখ্যাত আরও যেসকল স্থানসমূহ রয়েছে সেগুলো হলো: গান্ধার, মথুরা, সাঁচী, অজান্তা, ইলোরা, তক্ষশীলা, নালন্দা, মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর ও ময়নামতি প্রভৃতি। বৌদ্ধ তীর্থস্থান, মহাতীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থানগুলো ভারত-বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যের অত্যন্ত গৌরবময় কীর্তি। এ সব স্থানসমূহ বৌদ্ধ সভ্যতা ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির পীঠস্থানও বটে। সারা পৃথিবী হতে যেমন বৌদ্ধধর্মালম্বীরা এই ভারতভূমিতে অন্যান্য বৌদ্ধতীর্থস্থান ভ্রমনে আসেন ঠিক তেমনি 'সাংকাশ্য'ও ভ্রমনের মধ্যে দিয়ে আত্মতুষ্টি ও পূণ্য অর্জনের চেষ্টা করেন। এছাড়া পৃথিবীর অনেক দেশ থেকে পর্যটকরা 'সাংকাশ্য' পরিভ্রমণের মাধ্যমে নিজের মন ও আত্ম উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন। জানতে চেষ্টা করেন প্রাচীন ভারতের নান্দনিক সৌন্দর্য্যের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে। যার ফলে পর্যটকরা এ বিষয়ে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে নিজেদেরকে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করে থাকেন। অপরদিকে প্রাচীন ভারতভূমির যে ঐতিহাসিক গৌরবময় অর্জন সেটিও নতুনভাবে উন্মোচিত হওয়ার সুযোগ ও সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। আবার ঐতিহ্য মানুষকে সাংস্কৃতিক চর্চা করতে ও শেখাতে সাহায্য করে, সাংস্কৃতিক বিনিময় প্রচার করে, মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও বোঝাপড়ার সুবিধা দেয়। শুধুমাত্র পরিচয়কে শক্তিশালী করে না বরং ঐতিহ্য সংরক্ষণে সহায়তা করে। সুতরাং প্রাচীন ভারত ও বর্তমান ভারতের ইতিহাসে, বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে, এমনকি উপমহাদেশ তথা সারা বিশ্বের ইতিহাসে 'সাংকাশ্য' তথা 'সাংকাশ্য নগরী' স্বগৌরবে-স্বমহিমায় তাঁর গুরুত্ব ও মর্যাদা ধারণ করে টিকে ছিলো, আছে এবং আগামীতেও থাকবে সেটি আমরা একবাক্যে স্বীকার করতেই পারি। বাংলাদেশের বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদও এর বাহিরে নয়। আমরা আমাদের দেশের ঐতিহ্যসমূহকে ধারণে, লালনে এবং বিশ্ব দৃষ্টি আকর্ষণে আরও যত্নবান হবো-এটাই এ নিবন্ধের উপসংহার।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. ত্রিপিটকে কুরু রাজ্যের ইতিহাস খুব দীর্ঘ নয়। তবে এ রাজ্যে বুদ্ধ একাধিকবার পরিভ্রমণ করেছিলেন। এখানে 'কম্মাস্সধম্ম' নাম এক গ্রামে ভারদ্বাজগোত্রীয় এক ব্রাহ্মণের সাথে বুদ্ধের দীর্ঘক্ষণ তত্ত্ব আলোচনা হয়। পরে পরিব্রাজক মাগন্দিয় ও ব্রাহ্মণ বুদ্ধের দীক্ষা গ্রহণ করেন। এছাড়া থুল্লকোট্ঠিত নামক গ্রামে বুদ্ধ একবার ধর্মদেশনা করেছিলেন। এ সময় তাঁর ধর্মদেশনা শুনে রট্ঠপাল (রাষ্ট্রপাল) বুদ্ধের দীক্ষা নেন। পরবর্তীতে রট্ঠপাল বুদ্ধ শাসনের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। কুরুরাজ্য বর্তমান ভারতের হরিয়ানা প্রদেশের আমিন, কার্ণল ও পানিপথ জেলা নিয়ে গঠিত। রাজধানী ছিল ইন্দ্রপ্রস্থ (বর্তমান দিল্লীর কাছে ইন্দ্রপট এলাকা) বুদ্ধের সময়ে কুরুরাজ্যের রাজা ছিলেন ধঞ্জয়। ইনি খুবই ধার্মিক রাজা ছিলেন।

২. খন্দকার মাহমুদুল হাসান, *ভারতীয় উপমহাদেশের সভ্যতা ও প্রত্নকীর্তি*, সময় প্রকাশনী, ঢাকা-২০০০, পৃ. ৬৪

৩. *https://www.buddhanet.net/e-learning/buddhistworld/mapbud.htm* (Date: 07/10/2022)

৪. ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *জাতক*, *তৃতীয় খণ্ড*, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ১৪২২, পৃ. ২১৭

৫. *Wikipedia*, the free encyclopedia

৬. Leo A. Oppenheim, *Ancient Mesopotemia: Portrait of a Dead Civilization*, University of Chicago Press, Chicago, 1964

৭. এটি বর্তমান ভারতের বিহার প্রদেশের মোজাফফপুর জেলার নাগরা বসার নামে পরিচিত। বৈশালী বজ্জী প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ছিল। তথাগত বুদ্ধের সময়ে নগরটি সমৃদ্ধ, জনবহুল ও খাদ্য সম্ভারে স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিল। একদা এখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তা প্রতিকারের জন্য নগরবাসী লিচ্ছবীরা বুদ্ধকে আমন্ত্রণ জানান। বুদ্ধ আনন্দ স্থবিরকে সঙ্গে নিয়ে তথায় উপস্থিত হন। বুদ্ধের নির্দেশে আনন্দ স্থবিরকে সঙ্গে নিয়ে তথায় উপস্থিত হন। বুদ্ধের নির্দেশে আনন্দ স্থবির রতনসূত্র পাঠ করলে বৃষ্টি হয় এবং তাদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসে। বৈশালীর সৌন্দর্য সবাইকে মুগ্ধ করত। উদেন চৈত্য, পোতমক চৈত্য ও স্বত্তম্বক চৈত্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। বৈশালীর মহাবন কূটাগার শালা নামক বিহারে অবস্থানকালে বুদ্ধ বহু লোককে স্বধর্মে দীক্ষা দেন। এখানেই আনন্দ স্থবিরের অনুরোধে বুদ্ধ বহু লোককে সদ্ধর্মে দীক্ষা দেন। এখানেই আনন্দ স্থবিরের অনুরোধে মহাপ্রজাপতি গৌতমীসহ বহু শাক্য রমণীকে দীক্ষা প্রদানের অনুমতি দিয়ে সর্বপ্রথম ভিক্ষুণীসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। বীরশ্রেষ্ঠ ইক্ষাকুর পুত্র রাজা বিশালের নামানুসারে বৈশালী নামের উদ্ভব। অপরপক্ষে বিশাল রাজ্যের রাজধানী বলে নগরটির নাম বৈশালী রাখা হয়।

৮. পালি 'কোসম্বী' বা সংস্কৃত কৌশাম্বী হল বৎস জনপদের রাজধানী। বর্তমান নাম কোসম, যা ভারতের উত্তর প্রদেশস্থ এলাহাবাদের বত্রিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। বারাণসী হতে কৌশাম্বীর দুরত্ব নদীপথে প্রায় ২৪০ মাইল। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন কৌশাম্বী নগরের ঘোসিতারাম বিহারটি দেখেছিলেন। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে হিউয়েন সাং নগরটি পরিদর্শনকালে ভগ্নদশায় বহু বিহার, দেবমন্দির, স্তূপ ও ঘোসিত শ্রেষ্ঠীর বাড়ি দেখেন এবং বিহারগুলোতে বসবাসকারী বহু ভিক্ষুও দেখেন। পরবর্তীতে প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কারে নগরের গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, প্রশাসন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের আভাস পাওয়া যায়।

৯. এটি প্রাচীন কোশল রাজ্যের রাজধানী। ভারতের উত্তর প্রদেশের গোণ্ডা জেলার প্রাচীন অচিরাবতী (রাপতি) নদীর তীরে অবস্থিত। বর্তমান নাম সায়েত-মায়েত। 'সব্বমেত্থ অত্থী'তি সাবত্থি'-এখানে সবকিছু পাওয়া যেত বলে এর নাম শ্রাবস্তী। এক সময় আমদানী-রপ্তানির প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী নির্মিত 'জেতবন মহাবিহার', বিশাখার 'পূর্বরাম বিহার', রাজা প্রসেনজিতের 'রাজকারাম', তাঁর অগ্রমহিষী মল্লিকার 'মল্লিকারাম' এখানে অবস্থিত। ভগবান বুদ্ধের জীবনের সাথে শ্রাবস্তীর নিবিড় সম্পর্ক আছে। বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে ঊনিশ বর্ষা এবং পুর্বারাম বিহারে ছয় বর্ষা-সর্বমোট পঁচিশ বর্ষা শ্রাবস্তীর জেতবনে যাপন করেছিলেন। সম্রাট অশোকের সময়েও শ্রাবস্তীর খ্যাতি ছিল। খ্রিস্টীয় ৫ম শতকে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন শ্রাবস্তী পরিদর্শন করেছিলেন। বর্তমানে শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড প্রভৃতি তীর্থযাত্রীদের জন্য বৌদ্ধরাষ্ট্র নতুন বিহার ও যাত্রী নিবাস নির্মাণ করেছে।

১০. ভারতের বিহার প্রদেশের নালন্দা জেলার বর্তমানে রাজগির নামে পরিচিত মগধ রাজ্যের রাজধানী 'রাজগহ' মহাপরিনির্বাণ সুত্তন্ত অনুসারে, প্রাচীন ভারতেরই ছয়টি প্রধান নগরের মধ্যে অন্যতম ছিল। নগরটি প্রতিষ্ঠা করেন স্থপতি মহাগোবিন্দ। অধিকাংশ প্রাচীন পালিগ্রন্থে নগরটির উল্লেখ থেকে সহজে বোঝা যায় যে, প্রাক-মৌর্য ও মৌর্যযুগে তা প্রাণবন্ত অবস্থায় ছিল। রাজগৃহ ছিল মগধের প্রথম রাজধানী। বৌদ্ধযুগে তা রাজগহ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। রাজগহ নগরের প্রধান দু'টি অংশ ছিল। পর্বত বেষ্টিত প্রাচীন অংশটির নাম ছিল গিরিব্বজ এবং পর্বত শ্রেণীর পাদদেশে অবস্থিত পরবর্তী অংশটি রাজগহ। রাজগহ ছিল বৌদ্ধ ধর্মের এক শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান।

১১. করুণানন্দ ভিক্ষু, *পালিসাহিত্যে নগরবিন্যাস ও নগরজীবন*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪, পৃ. ৯

১২. এটি ত্রিপিটক বহির্ভূত গ্রন্থ। কিন্তু ত্রিপিটকের সারসংক্ষেপ এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে যুক্তি, তর্ক, উদাহরণ ও উপমা সহকারে।

১৩. V. Gordon Childe, *The Urban Revolution*, Town Planning Review, Vol : 21, 1950, p. 4-7

১৪. Gideon Sjoberg, *The Preindustrial City of Past and Present*, New York, 1960, pp. 69, 75

১৫. সাধনানন্দ মহাস্থবির, *সুত্তনিপাত*, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৭১

১৬. সুকোমল বড়ুয়া ও রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, *পালি সাহিত্যে ধম্মপদ*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭, পৃ. ১২৮

১৭. বিম্বিসার (৫৫৮ খ্রিঃপূঃ-৪৯১ খ্রিঃপূঃ) হর্য্যাঙ্ক রাজবংশের রাজা ছিলেন।

১৮. হর্য্যঙ্ক রাজবংশের রাজা ছিলেন, যিনি ৪৯২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৪৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত মগধ শাসন করেন। তাঁর শাসনকালে হর্য্যঙ্ক রাজবংশের শাসন সর্বাধিক বিস্তৃত হয়। অজাতশত্রু হর্য্যঙ্ক রাজবংশের রাজা বিম্বিসার ও কোশল রাজকন্যা চেলেনার পুত্র ছিলেন। গৌতম বুদ্ধের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ বৌদ্ধ ভিক্ষু দেবদত্তের পরোচনায় অজাতশত্রু বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক বিম্বিসারকে হত্যার চেষ্টা করেন। বুদ্ধের মতাদর্শে বিশ্বাসী বিম্বিসার এই ঘটনায় তাঁর পুত্রকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু পুনরায় দেবদত্তের প্ররোচনায় অজাতশত্রু বিম্বিসার ও তাঁর উপদেষ্টামণ্ডলীকে গৃহবন্দী করে নিজেকে মগধের শাসক হিসেবে ঘোষণা করেন। ৪৯১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গৃহবন্দী অবস্থায় বিম্বিসারের মৃত্যু ঘটে। এই সময় দেবদত্তের প্ররোচনায় তিনি গৌতম বুদ্ধকে হত্যার চেষ্টা করেন। পিতার মৃত্যুর পর অনুশোচনায় দগ্ধ অজাতশত্রু শান্তিলাভের আশায় বিভিন্ন ধর্ম উপদেষ্টা ও দার্শনিকের শরণাপন্ন হন। কিন্তু তাঁদের উপদেশে শান্তিলাভে ব্যর্থ হয়ে রাজবৈদ্য জীবকের উপদেশে গৌতম বুদ্ধের শরণাপন্ন হলে বুদ্ধ তাঁকে সামঞ্ঞফলসুত্ত ব্যাখ্যা করেন।

১৯. সময় গণনাকে পালিতে কল্প বলে। কল্প মানেই অতি অতি দীর্ঘকাল সময়কে কল্প বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। কল্প মোট ৬টি রয়েছে। তার মধ্যে ভদ্রকল্প একটি। ভদ্রকল্পে ৫জন উৎপন্ন হয়।

২০. মনোরঞ্জন বড়ুয়া, *বৌদ্ধতীর্থ পর্যটন*, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ৬৮

২১. *Wikipedia*, the free encyclopedia

২২. রণধীর বড়ুয়া, *মহামানব বুদ্ধ*, ১৯৫৭, চট্রগ্রম, পৃ. ১১০

২৩. ধর্মাধার মহাস্থবির, *ধম্মপদ*, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা, কলিকাতা ১৯৫৪, পৃ. ৫৮

২৪. H. Oldenberg ed. *Vinaya-piṭaka*, PTS, London, 1969, p.12

২৫. ধম্মতিলক, *সদ্ধম্ম-রত্নাকর*, দি করপোরেট বডি অব দি বুদ্ধ এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন, তাইওয়ান, ১৯৩৬, পৃ. ৪০২

২৬. ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *জাতক*, *ষষ্ঠ খণ্ড*, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ১৪২২, পৃ. ৬৭

২৭. করুণানন্দ ভিক্ষু, *পালিসাহিত্যে নগরবিন্যাস ও নগরজীবন*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪, পৃ. ১৬২

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬২

২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬২-১৬৩

৩০. বিমল চন্দ্র দত্ত, *বৌদ্ধ ভারত*, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলিকাতা, পৃ. ৯৮

৩১. রফিকুল আলম, *বিশ্ব সভ্যতা ও শিল্পকলা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ২৩২-২৩৩

৩২. করুণানন্দ ভিক্ষু, *পালিসাহিত্যে নগরবিন্যাস ও নগরজীবন*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪, পৃ. ১৬২

৩৩. *Wikipedia*, the free encyclopedia

৩৪. *Wikipedia*, the free encyclopedia

৩৫. *Wikipedia*, the free encyclopedia

৩৬. হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরী সম্পাদিত, *বুদ্ধপ্রণাম*, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা, ১ম সংস্করণ, কলিকাতা-১৯৯৩, পৃ. ৩১

৩৭. *UNWTO world Turism Highlights*, 2011, ১৩ জানুয়ারী ২০১২ তারিখে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৯ জানুয়ারী ২০১২

৩৮. 'International tourism revenue', *Statistics*, সংগ্রহের তারিখ ১৮.০৫.২০২২

৩৯. মোহাম্মদ বদরুজ্জামান ভুঁইয়া, *যুগান্তর পত্রিকা*, ০৪ ফেব্রুয়ারি ১০১৯